Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 148-151

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘যযাতি’ কবিতায় মহাভারতের কতটা প্রভাব পড়েছে তার সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

Sulekha Ghosh
M.A in Bengali
Rabindra Bharati University,West Bengal, India
Email- sulekha.file94@gmail.com

Accepted: 23/10/2025
Published: 28/10/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.17760775*

Abstract

কবিতা হল শব্দ প্রয়োগের ছান্দসিক কিংবা অনিবার্য ভাবার্থের বাক্য বিন্যাস যা একজন কবির আবেগ-অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তা করার সংক্ষিপ্ত রূপ। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু হয় কবিতা দিয়ে। ১৯০১ সালে ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশরীতি ও অভিজ্ঞতার পরিধি যদিও ছোট কিন্তু গভীর আর নিঁখুত নিটোল। ১৯৬০ সালের ২৫শে জুন তিনি পরলোকগমন করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘যযাতি’ কবিতাটি তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম কবিতা হিসাবে বিবেচিত হয়। তাঁর “সংবর্ত” কাব্যের ‘যযাতি’ কবিতাটি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই কাহিনীটি মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র ‘যযাতি’-র জীবনের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর ‘যযাতি’ কবিতায় নিজের জীবনকাহিনী উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের যযাতি আত্মোপলব্ধি করতে পারেনি তাই সে তার জরা দিতে চেয়েছে তার পুত্রকে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রাজ্ঞ, তিনি নৈতিক মূল্যবোধহীন নন। মহাভারত হল সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের মধ্যে একটি। অপরটি হল রামায়ণ। মহাভারত কথাটির অর্থ হল ‘ভরত’ বংশের মহান উপাখ্যান। যা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থেই আমরা মহাভারতের প্রভাব দেখতে পাই। যেমনটা দেখতে পাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘যযাতি’ কবিতায়। কবি আলোচ্য কবিতায় নিজেকে অকাল জরায় শুক্রশাপে আবদ্ধ নন বলে পাঠকদের জানিয়েছেন। মহাভারতের ‘যযাতি’-র জীবনের ঘটনাক্রম থেকে মানবের যে শিক্ষা নেওয়া উচিত তা আলোচ্য কবিতার মধ্যে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মহাভারতের সাথে আধুনিকতাকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন, যা আলোচ্য কবিতাটিকে বিশেষ রূপ দান করেছে। আলোচ্য কবিতায় কবি সুকৌশলে মহাভারতের কাহিনীর মাধ্যমে আধুনিক জীবনের সংকটকে তুলে ধরেছেন। এককথায় বলতে গেলে পৌরাণিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্বকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষতার সঙ্গে এমনভাবে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা আলোচ্য কবিতাটিকে বিশেষমাত্রায় চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

Keywords: *ছান্দসিক, ভাবার্থ, পঞ্চপাণ্ডব, নিটোল, জরাগ্রস্ত, বীতশ্রদ্ধ, প্রাজ্ঞ, ত্রিশঙ্কু, অপমৃত, অভিব্যক্তিবাদ, শুক্রশাপ, সপ্তরথী, চিত্তাকর্ষক, বহুধাবিস্তৃত।*

"কবিত্ব হল নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা, কবি নিজের কল্পনা দিয়ে শব্দের ওপর শব্দ সাজিয়ে এক অপরূপ মায়ার জগৎ তুলে ধরেন।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভূমিকা:-

কবিতা হল শব্দ প্রয়োগের ছান্দসিক কিংবা অনিবার্য ভাবার্থের বাক্যবিন্যাস যা একজন কবির আবেগ-অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তা করার সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রিক শব্দ **"Poiesis"** থেকে কবিতা শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ হল **"নির্মাণ"** অথবা **"তৈরি করা"**। কবিতা সাহিত্যের আদিমতম একটি শাখা। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু হয় কবিতা দিয়ে। বাংলাভাষা তথা সাহিত্যের ইতিহাসে **"চর্যাপদকে"** প্রথম কবিতার নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য নানাভাবে বাংলা কাব্য-কবিতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সবিশেষ বাংলা কবিতা ও কাব্যের জগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে একে একে আবির্ভূত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখরা। এককথায় বললে এটাই বলতে হবে যে, বাংলা কবিতার সৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাসটি অতি দীর্ঘ।

কবি পরিচয়:-

১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর কলকাতা শহরের হাতিবাগানে সুধীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতকের ত্রিশ দশকে যে পঞ্চপাণ্ডব কবিরা বাংলা কবিতার জগতে আধুনিকতার সূচনা ঘটান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মায়ের নাম ইন্দুমতি বসুমল্লিক। তিনি ১৯৩১ সালে **'পরিচয়'** পত্রিকায় সম্পাদনা শুরু করেন। ১২বছর ধরে সম্পাদকের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রকাশরীতি ও অভিজ্ঞতার পরিধি যদিও ছোট কিন্তু গভীর আর নিঁখুত নিটোল। ১৯২৪ সালে তাঁর ছবি বসুর সহিত বিবাহ হয় এবং ১৯৬০ সালের ২৫শে জুন তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

যযাতি কবিতার সারসংক্ষেপ:-

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের **'যযাতি'** কবিতাটি তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম কবিতা হিসাবে বিবেচিত হয়। যযাতি একটি পৌরাণিক চরিত্র। এর কাহিনীটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র যযাতির জীবনের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত **'যযাতি'** কবিতায় নিজের জীবনকাহিনীকে উল্লেখ করেছেন। তবে মহাভারতের যযাতিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি, কিছুটা অনুসঙ্গ গ্রহণ করেছেন মাত্র। সন্তানহীন কবি এখানে স্বকীয় জীবনেরই প্রতীক হিসাবে যযাতিকে গ্রহণ করেছেন। যযাতির দুই পত্নী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। কবির জীবনেও প্রথম পত্নীর সাথে মানসিক দূরত্ব, দ্বিতীয় পত্নীর সাথে বিবাহপূর্বক পরিচয়, বিবাহ, প্রথম পত্নীকে পরিত্যাগ এই অনুসঙ্গে যযাতির সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য পেয়েছেন কবি। তবে মহাভারতের যযাতির পুত্রের জরা বিনিময় এই প্রসঙ্গটি আত্মোপলব্ধির অভাব বলা যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যযাতি বিশ শতকের নৈতিক মূল্যবোধহীন জরাগ্রস্ত সমাজে একমাত্র প্রাজ্ঞ মানুষ। মহাভারতের যযাতি আত্মোপলব্ধি করতে পারেনি তাই সে সংগ্রামে রত হয়নি। সে তার জরা দিয়ে দিতে চেয়েছে তার পুত্রকে। যা হল আত্মোপলব্ধির অভাব, প্রাজ্ঞের অভাব, নৈতিক মূল্যবোধহীনতা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকে দাঁড়িয়ে প্রাজ্ঞ, নৈতিক মূল্যবোধহীন নন তিনি। তাই তিনি জরার সঙ্গে সংগ্রামে রত। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন -

"আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি ক্ষেপাতে পারে না আর। চরাচরে নেতির বিস্তার নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধিঃ"[1]

অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন বিশ্বচরাচরে নেতির বিস্তার। তবুও সেখানে কবির চিত্তবিক্ষেপ ঘটে না। উপনিষদে যে ব্রহ্মাকে নিরাকার বলা হয়েছে, কবির ভাবনায় সেই ব্রহ্মা কেবল নিরাকার নয়, সমাধিমগ্ন। তাই মানুষের কোনো প্রার্থনাই তার কর্ণগোচর হওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে কবি অভিমন্যুর প্রসঙ্গ এনেছেন। অভিমন্যুও ফেরার রাস্তা জানতে পারেনি। তাই কবি যেকোনো একনায়কতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ। তা সাম্যবাদ হোক বা ফ্যাসিবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জরাকীর্ণ সমাজে মানুষের মধ্যে একমাত্র প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কবির নিজের উপলব্ধিকেই যযাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। **'সংবর্ত'** কবিতার মতো এখানেও তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান।

[1] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংবর্ত', প্রকাশক-দিলীপকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা নং-৪৮।

তিনি আছেন কিন্তু হয় অপমৃত না-হয় সমাধিস্থ। **'যযাতি'** কবিতায় কবি এও বলেছেন-

> **"অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে।"[2]**

এখানে ত্রিশঙ্কু রাজা কিংবা দ্বৈপায়ন অর্থে ব্যাসদেব নয়। **'ত্রিশঙ্কু'** অর্থে প্রকাশ পেয়েছে আশ্রয়হীন এবং **'দ্বৈপায়ন'** অর্থে প্রকাশ পেয়েছে নিঃসঙ্গ। আসলে ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্বরতা এসব সুধীন্দ্রনাথের মননে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অর্ধশতাব্দী ধরে রাজনীতির পাশাখেলা দেখে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিদের মতো গণতন্ত্রে আস্থা হারিয়েছেন তিনি। আস্থা রাখতে পারছেন না অভিব্যক্তিবাদেও। নতুন কিছুর সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পারছেন না। তাই প্রগতিতে তিনি পশ্চাৎপদ যেমন, ঠিক তেমনি অতীতের কাছেও তাঁর শিক্ষা নেবার কিছু নেই। কারণ অতীত, বর্তমান এবং সামনের ভবিষ্যত সবই তাঁর কাছে জটিল। এরূপ পরিবেশে কবির মধ্যেকার যে নিঃসঙ্গতা, এবং আত্মোপলব্ধি তারই ধারাবিবরণী **"সংবর্ত"** কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে বিশেষত **'যযাতি'** কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

<u>মহাভারতের পরিচয়</u>:-

মহাভারত হল সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের মধ্যে একটি। অপরটি হলো রামায়ণ। মহাভারত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্বারা রচিত হয়েছিল। মহাভারতের আদি নাম ছিল **'জয়সংহিতা'**। মহাভারতে মোট ১৮টি অধ্যায় তথা **'পর্ব' ও** ১০০টি **'উপপর্ব'** আছে। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম মহাকাব্য। এছাড়াও ১,০০,০০০ স্তবক, ২০০,০০০ পংক্তি এবং ১.৮ মিলিয়ন শব্দ এই মহাকাব্যে বর্তমান। এই মহাভারতেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল **'ভগবদগীতা'**। মহাভারত হিন্দুদের একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় যা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গঠিত। এর মূল উপজীব্য বিষয় হল কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। মহাভারত কথাটির অর্থ হল **'ভরত'** বংশের মহান উপাখ্যান। এর আয়তন ইলিয়ড ও ওডিসি কাব্যদ্বয়ের সম্মিলিত আয়তনের ১০(দশ) গুণ এবং রামায়ণের ৪(চার) গুণ। বাংলাতে মহাভারতের বিশালতা সম্পর্কিত একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ আছে -

> **"যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।"**

প্রবাদটির অর্থ হলো, "মহাভারতে যা নেই, তা এই ভারতবর্ষেও নেই।" বাংলাসাহিত্যে বেশীরভাগ গ্রন্থে আমরা রামায়ণ, মহাভারত এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব দেখতে পাই সর্বকালেই। ঠিক তেমনই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের **'যযাতি'** কবিতায় **'মহাভারতের'** যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই **'পৌরাণিক কাহিনী'** সাহিত্যের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ উপাদান। পৌরাণিক বিশ্বাসের জগৎ থেকে বহুদূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ বারবার আনয়ন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, **'পুরাণ'** প্রয়োগে বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমভাবাপন্ন। তবে বিষ্ণু দে পুরাণ ব্যবহারে যেরূপ বহুব্যাপক, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেরূপ নন। তিনি প্রতীচ্য পুরাণ ব্যবহারে অত্যন্ত সংযত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের **'যযাতি'** কবিতাটি হল পঞ্চাশ উত্তীর্ণ এক ব্যক্তির আত্মরক্ষার ইতিহাস। এই আত্মরক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক উঠে এসেছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সমাজের বৈরী পরিবেশ বিদ্ধ করেছে যন্ত্রনায়। আলোচ্য কবিতায় সেই প্রসঙ্গ আছে। তিনি মহাভারতের একটি অংশকে চিহ্নিত করে আলোচ্য কবিতায় লিখেছেন -

> **"....দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না-থাক, অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে; অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।"[3]**

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাভারতের যে কাহিনীকে নবরূপ দিয়েছেন তা হল চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির দুই স্ত্রী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনীকে আলোচ্য কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি আলোচ্য কবিতায় বলেছেন দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহে কবির অদ্বৈত সিদ্ধি পণ্ড হোক বা না-হোক তিনি অকাল জরায় শুক্রশাপে আবদ্ধ নন। বলাবাহুল্য দেবযানী-শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গটি তিনি **'মহাভারত'** থেকে সংগ্রহ করেছেন।

পৌরাণিক কাহিনী সর্বসময় মানবজীবনে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। মহাভারতের যযাতির জীবনের ঘটনাক্রম থেকে মানবের যে শিক্ষা নেওয়া উচিত তা কবি আলোচ্য কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, জীবনের প্রকৃত সুখ ভোগবিলাসে নয়, বরং আত্মোপলব্ধি এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই তা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আলোচ্য কবিতায় উল্লেখ করেছেন -

[2] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংবর্ত', প্রকাশক- দিলীপকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা নং-৪৭।

[3] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংবর্ত', প্রকাশক-দিলীপকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা নং-৪৮।

"প্রকট ব'লে সম্ভোগের
অনন্ত বঞ্চনা,
পঞ্চাশে পা না দিতেই,
অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাকঃ
এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে
আজও উদ্ভাবনা।"[4]

সুধীন্দ্রনাথের পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহারের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কালোচিত তাৎপর্যে তিনি তা প্রয়োগ করেন। আলোচ্য **'যযাতি'** কবিতার এই কাহিনীটি কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বের **'দেবযানীর বিবাহ'**, **'যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপে'**, **'যযাতির যৌবন প্রাপ্তি এবং পুরুর জরাগ্রহণ'** প্রভৃতি অংশ অবলম্বনে গৃহীত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় তিনি অভিমন্যু প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি বলেছেন সংসার শুধু আসক্তি, ঘৃণা, চক্রান্ত, সর্বনাশ, ঈর্ষা। কিন্তু কবি বিচলিত হন না। আসলে চরাচর জুড়ে নেতির বিস্তার নিরাকার ব্রহ্মের সমাধিসম বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন এই পরিবেশে মানুষের প্রার্থনা যেন অভিমন্যুর সপ্তরথীর বিরুদ্ধে বাঁচার আকুল আবেদনের মতো ব্যর্থ বলে মনে হয় -

"অন্তত এ-পরিবেশে
মানুষের প্রার্থনা সমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু; তবু
স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি।"[5]

'যযাতি' কবিতায় জীবন, মৃত্যু, সময় এবং অভিজ্ঞতার দার্শনিক দিকটিও কবি উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য কবিতাতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাভারতের কাহিনীর সাথে আধুনিকতাকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন, যা কবিতাটিকে বিশেষ রূপ দান করেছে। তিনি শুধুমাত্র মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করেননি, তার মাধ্যমে মানবজীবনের গভীরতম সত্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন সর্বতোভাবে।

উপসংহার:-

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় মহাভারতের প্রসঙ্গ এতটাই গভীরভাবে সংযুক্ত যে, এই বিষয়ের তাৎপর্য ও প্রবণতা অনুধাবন করলেই আমরা কবিমানস ও কবিভাবনার সমীপবর্তী হতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি, কিভাবে সুধীন্দ্রনাথের মানব বিবর্তনের সাথে পৌরাণিক চেতনার মাত্রাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কবি সুকৌশলে তাঁর **'যযাতি'** কবিতায় মহাভারতের কাহিনীর মাধ্যমে আধুনিক জীবনের সংকটকে তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্বকে তিনি দক্ষতার মাধ্যমে এমনভাবে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা আলোচ্য **'যযাতি'** কবিতাটিকে বিশেষমাত্রায় চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। আশা করা যায়, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের সুহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ও বাংলাবিভাগের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন এবং তারা আগামীতে এই লেখাটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। যা তাদের আলোচ্য বিষয়টির উপর পুনঃসমীক্ষা করার জন্য আগ্রহী করে তুলবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা।

২। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, সংবর্ত, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০, আবুসয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরেব করকমলে, প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, প্রকাশক- দিলীপকুমার গুপ্ত।

৩। মণ্ডল, ড.সন্তোষকুমার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, ১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

৪। পাত্র, ড.প্রদীপকুমার, আধুনিক বাংলা কবিতায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ।

৫। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, চক্রবর্তী জগন্নাথ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং॥ কলকাতা – ৭০০০৭৩।

৬। বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, খণ্ড-২, কলকাতা : বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩৩৯, পৃ. ১৯৮৫।

৭। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পুরাণ, সাহিত্যপত্রিকা, সিদ্দিকা মাহমুদ, February 1991.

৮।সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত। সন ১৩৩২ সাল। ২৭/৫ নং তারক চাটুর্য্যের লেন, "অক্ষয় প্রেসে" শ্রী নন্দলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****

[4] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

[5] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংবর্ত', প্রকাশক-দিলীপকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা নং-৪৮।